OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 63
Website: https://tirj.org.in, Page No. 530 - 545
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, published on July 2024, Page No. 530 - 545
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলা কথাসাহিত্যে স্বামী বিবেকানন্দের বহুমুখী প্রতিভার পরিচয়

সিদ্ধার্থ দত্ত
অধ্যাপক, বিষ্ণুপুর রামানন্দ কলেজ
গবেষক
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : Siddhartha.datta84@gmail.com

Received Date *16. 06. 2024*
Selection Date *20. 07. 2024*

Keyword
Swami Vivekananda, Mahajivan, middle-class, Bengali fiction, multi-faceted.

Abstract
Swami Vivekananda's predecessor in Bengali fiction many In many ways. From that point of view, Swami Vivekananda's multi-faceted talent in Bengali fiction gained relevance in many ways. His multi-faceted talents are identified as, a) World conqueror Swami Vivekananda, b) Heroic monk Vivekananda, c) Dishari Swami Vivekananda of the middle class, d) Mahajivan Swami Vivekananda, e) Mahanava Swami Vivekananda, c) Mahapurusha Swami Vivekananda etc. Swami Vivekananda Swami Vivekananda is one of the most versatile geniuses in the world. In the field of fiction, many writers have presented that story in different ways. Swami Vivekananda 's fearless personality is very well known. There, the identity of Vivekananda, the heroic monk, became natural in his strong personality. Swamiji's humanitarian appeal not only stirred the hearts of Bengalis, Illuminated and did. He became a middle-class leader. The word 'Mahajivan' gives us the search for that life which is enlightened and rich in character, action, human thought. Much literature has been created on the life of Swami Vivekananda. The identity of the great man Swami Vivekananda has gained a lot of attention in Bengali fiction. Swami Vivekananda's existence in the great human spirit naturally got the identity of great man. In the same way, many writers have found the identity of Mahapurusha Swami Vivekananda in Swamiji.

Discussion

কথাসাহিত্যে স্বামী বিবেকানন্দের আগমন বহু ভাবে, বহু রূপে। একজন রক্তমাংসের সজীব মানুষ বছরের পর বছর ধরে সমাজ-ধর্ম ও ব্যক্তিজীবনে সমানভাবে আলোচিত, আজও সমান আকর্ষণীয় হয়ে আছেন, তা শুধু আমাদের মুগ্ধ করে না, বিস্মিত করে। দিন যত এগিয়ে চলেছে, ততই তিনি যেন উচ্চবিত্ত বাঙালি থেকে মধ্যবিত্ত বাঙালির মন ও মনের আশ্রয় হয়ে উঠেছেন। তাঁর স্বল্পায়ু জীবনের দীপ্তি মানুষের হৃদয়াকাশে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বতর হয়ে উঠছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে

ভাবধারা বাংলাদেশে প্রবাহিত হয়েছিল তার মূলে ছিল নবজাগরণের তীব্র প্রবাহ। পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রবল সংঘাতে বাঙালিমানস দিশাহারা হয়ে পড়ে। সংস্কার যুগের আলোড়নে সেদিনের নাগরিক সমাজ হতচকিত হয়ে যায়। দেখা দিয়েছিল এক আত্মিক সঙ্কট। মানুষের চিন্তা ও ভাবনার মধ্যে চিত্ত চাঞ্চল্যের জন্ম দিয়েছিল। ব্যক্তিসাধারণের মন যুক্তি ও তর্কের কষ্টিপাথরে প্রচলিত ধ্যান-ধারণাকে যাচাই করে চায়। বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতির পীঠস্থান কলকাতায় প্রাচীন ধারণার মূলে কুঠারাঘাত হানে নব্য শিক্ষিত যুবকের দল। ব্রাহ্মধর্মের প্রতি অনেকেই বীতশ্রদ্ধ ও বিমুখ হয়ে উঠেছিল। হিন্দুধর্মের সংস্কারের নামে অসংখ্য ধর্মীয় গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে সনাতনী হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণের দ্বন্দ্বে দিকভ্রষ্ট বাঙালি সমাজকে উনিশ শতকের শেষ দশকে চেতনার জাগরণ ঘটালেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর আত্মবিশ্বাসের আলোয় আলোকিত, জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা সমর্থিত, হৃদয় দ্বারা প্রসারিত, কামনাবিহীন কর্মের দ্বারা নিবোধিত বিশেষত্বে তিনি ধর্মীয় পরিসরকে আলোকিত করেন, মানুষের মধ্যে ত্যাগ ও সেবার আদর্শকে জাগিয়ে তোলেন, ধর্মের অভিমুখটিই মানবসেবার দিকে ফিরিয়ে আনেন। স্বামীজির সেই দিগন্তবিস্তারী যুগান্তর সৃষ্টিকারী ব্যক্তিত্ব স্বাভাবিক ভাবেই বাংলা কথাসাহিত্যের বিষয়আশয় হয়ে ওঠে। তাঁর ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের অন্তরালে রক্তমাংসের মানুষের বহুধাব্যপ্ত চরিত্রটির অতুলনীয় মাহাত্ম্য স্বাভাবিক ভাবেই কথাসাহিত্যের বাস্তব ও কল্পনার রাজ্যে স্বাভাবিক ভাবেই সময়ান্তরে তীব্র আবেদনক্ষম মনে হয়। সেদিক থেকে বাংলা কথাসাহিত্যে স্বামী বিবেকানন্দের বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় নানাভাবে প্রাসঙ্গিকতা লাভ করে।

কথাসাহিত্যে স্বামী বিবেকানন্দের বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় সময়ান্তরে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে। সেসব পরিচয়কে নিবিড়ভাবে তুলে ধরার জন্য সুনির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক আলোচনা একান্ত জরুরি। তাতে তাঁর বহুমুখী প্রতিভার সুবোধ্য হয়ে উঠবে। সেগুলি হল – ক. বিশ্বজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ, খ. বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, গ. মধ্যবিত্তের দিশারি স্বামী বিবেকানন্দ, ঘ. মহাজীবন স্বামী বিবেকানন্দ, ঙ. মহামানব স্বামী বিবেকানন্দ, চ. মহাপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি।

ক. বিশ্বজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ :

স্বামী বিবেকানন্দের বহুমুখী প্রতিভার পরিচয়ের মধ্যে অন্যতম হল বিশ্বজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি দেশে-বিদেশের মানুষের কাছে ছড়িয়ে পড়েছিলেন আমেরিকার ধর্মমহাসভায় (১৮৯৩-এ ১১ সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত শিকাগো বিশ্ব ধর্মসম্মেলন) বিশ্বজয়ী বক্তৃতার পর থেকে। বিদেশের মাটিতে শাশ্বত ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হয়ে যেমন ভারতবর্ষকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছিলেন, তেমনি আবার দেশের মাটিতে বিশ্বজয়ের গৌরবকে আপামর ভারতবাসীর মন ও প্রাণকে আলোকিত করেছিলেন। কথাসাহিত্যের আসরে অনেক সাহিত্যিক সেই কাহিনিকে নানাভাবে তুলে ধরেছেন। এ সম্পর্কে প্রথমেই যিনি বিশ্বজয়ী স্বামী বিবেকানন্দের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন অন্নপূর্ণা দেবী। তাঁর 'স্বামী বিবেকানন্দ' গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দ। কাহিনির মধ্যে স্বামীজির সমগ্র জীবনকে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে তাঁর বাল্যজীবন ও কৈশোর জীবনকে স্পর্শ করে গেছেন লেখক। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রবল থাকার কারণেই লেখক আবেগকে সংযত করতে পারেননি। এই ধারারই আর একটি উপন্যাস হল শ্রীমতী গুপ্তের 'বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ' (১৯৫৭) গ্রন্থটি। উপন্যাসটিতে স্বামীজির জীবনের ধারাকে সহজ সরল ভাবে গতিশীল করেছে, ঠিক তেমনি সুন্দর ভাবে কাহিনির স্বকীয়তা বজায় রেখেছে। তাঁর জন্মগ্রহণ থেকে শুরু করে জীবনের শেষ অধ্যায় পর্যন্ত অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরে প্রকাশিত হয়েছে। কাহিনির অভিনবত্ব কোন কোন স্থানে বেশ চমকপ্রদ।

এই ধারারেই আরও একটি উপন্যাস হল নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ' (২০১৯)। গ্রন্থটি বিশ্বজয়ী স্বামী বিবেকানন্দের পরিচয়কেই সূচিত করে। গ্রন্থটি স্বামীজির জীবনের ধারাবাহিক ঘটনাকে চিত্রিত করেছে। তাঁর বাল্যকালের কথা, ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয়, ঠাকুরকে নিজের করে পাওয়া, গুরুরূপে বরণ, পরিব্রাজক রূপে ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ, সকল কিছুই লেখক অতি সুকৌশলে, সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণনা করেছেন। এই পরিব্রাজক অবস্থায় যখন তিনি ভ্রমণ করছেন, তখনই একদিন মনে জেগে উঠেছিল আমেরিকার শিকাগো শহরে ধর্মমহাসভায় যাওয়ার কথা। মনের মধ্যে ছিল তীব্র কৌতূহল; কেননা পাশ্চাত্যবাসীকে শোনাতে হবে হিন্দুধর্মের কথা। ভারতের মহিমার কথা বিশ্ববাসীকে জানাতে হবে। শিকাগো ধর্মমহাসভায় তিনি শাশ্বত ভারতবর্ষের কথা শুনিয়েছিলেন। গুরুর আশীর্বাদে তিনি পাশ্চাত্যবাসীর কাছে নিজেকে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 63
Website: https://tirj.org.in, Page No. 530 - 545
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর এই কীর্তি শুধু আমেরিকাতেই নয়, সুদূর ইংল্যাণ্ডেও ছড়িয়ে পড়ল। মানুষের কাছে এই বিশ্ববিজয়ী বীর নবজীবনের আলোকবর্তিকা হয়ে উঠেছিলেন।

খ. বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ :

স্বামী বিবেকানন্দকের নির্ভীক ব্যক্তিত্বের পরিচয় অত্যন্ত। সেখানে তাঁর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বে বীরত্বের পরিচয় আপনাতেই স্বাভাবিকতা লাভ করে। উপন্যাসের নামকরণেও তার পরিচয় বর্তমান। এরকমই একটি উপন্যাস 'বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ'। এটি ১৯৬২ তে প্রকাশিত হলেও সেখানে লেখকের নাম পাওয়া যায় না। অলংকার মণ্ডিত কাব্যিক ভাষায় গ্রন্থটি সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে। কাহিনি যেন এখানে গৌণ, মুখ্য হয়ে উঠেছে ভাষার আলঙ্কারিক সৌন্দর্য। কাহিনির শুরুতেই কাব্যিক ভাষায় লেখক অনাগত ভবিষ্যতের কাণ্ডারি নরেন্দ্রনাথকে বর্ণরঙিন করে তুলেছেন। তবে উপন্যাসের প্রতিটি ছত্রের মধ্যে ভিন্ন স্বাদের বার্তা থাকলেও, শব্দকে জটিল করতে গিয়ে লেখক মাঝে মাঝে ভাবের সংযম হারিয়ে ফেলেছেন।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' (১৩৬৫) গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটিতে স্বামীজির বাল্যকাল থেকে শুরু করে আমেরিকা যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থটির সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব হল সহজ, সরল বর্ণনার মধ্যে দিয়ে কাহিনী গতি পেয়েছে। আবার কোথাও কোথাও আবার কাব্যিক ও বিশেষণ মন্ডিত ভাষা ও ভাব এতই স্পষ্ট যে, বাস্তবতা কল্পনার আবরণে ঢাকা পড়ে গেছে। বইটিতে লেখক দেখিয়েছেন নরেন্দ্রনাথ যে ভবিষ্যতে কালের ধারক ও বাহক হবেন। সে ইঙ্গিত পাওয়া যায় বালক নরেন তাঁর পিতার কথোপকথনকালে। বাবাকে নরেন বড় হয়ে কোচোয়ান হওয়ার কথা জানিয়ে দেন। লেখকের মনে হয়েছে, নরেন চেতনার চাবুক মেরে ধর্ম ও কর্ম নামে দুই ঘোড়াকে চালনা করবে, আমাদের এই অলস দেশে। স্বামীজির প্রচলিত জীবনীর ছকেই অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর উপন্যাসটিতে বীরেশ্বর বিবেকানন্দকে রাঙিয়ে তুলেছেন।

অন্যদিকে উপন্যাসটির গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডটি (তৃতীয় সংস্করণ ১৩৫৫) শুরু হয়েছে স্বামীজির আমেরিকা যাওয়ার ঘটনা থেকে। কাহিনি কাব্যিক অলংকারময় বিশেষণে সুখপাঠ্য হয়েছে, কিন্তু আবেগের স্রোতে কখনও কখনও বাস্তবতা দূরে সরে গেছে। কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবতার চূড়ান্ত প্রকাশও আছে। সেই প্রকাশের পূর্ণ পরিণতি দেখতে পাই আমেরিকায় স্বামীজির অবস্থানকালে। হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন হেনরি রাইট স্বামীজির পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন সেখানকার এক ধর্মীয় স্থানে। সেখানে উপস্থিত শ্রোতারা তাঁর ভাষণ মন্ত্র মুগ্ধের মত শুনল। পাশ্চাত্যদেশে যাওয়ার আগে তিনি স্বামী তুরীয়ানন্দকে বলেছিলেন, তাঁর জন্যই এই ধর্মমহাসভা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে।

কাহিনির মধ্যে স্থান পেয়েছে স্বামীজির পাশ্চাত্য বিজয় প্রাধান্য পেলেও তা অনেকেই সুনজরে নিতে পারেনি। মিথ্যা কুৎসা, অপপ্রচার, ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র শুরু করেছিল তারা। তাদের হীন আচরণে তিনি ব্যথিত হয়েছিলেন, কিন্তু ভেঙে পড়েনি। তিনি জানতেন সমস্ত বিশ্বকে তিনি উদারতার ও মানবতার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছেন, শুনিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী। লোকে তাঁর সম্পর্কে কি বললো, তাতে তাঁর কিছু যায় আসে না। তিনি মানুষের দুঃখ, কষ্টে ব্যথিত হয়েছেন আবার তাঁদেরকে ভালবেসেছেন। তাঁদেরকে তিনি জানিয়েছেন ধর্ম হল মানবিক চেতনার প্রকাশ। গ্রসম্যানের তাঁর মানবিক ধর্ম সম্পর্কে বলেছিলেন, তিনি এই সত্য শিখিয়েছিলেন ধর্ম হবে জীবন্তরূপে কর্ম। তিনি আরও বলেছিলেন, ধর্ম সব দেশে, সব কালে সমানভাবে গ্রহণীয়। ধর্ম হল ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস আর তাকে অন্তর থেকে ভালোবাসা। কিন্তু সেই ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ দূরে সরে গেছে। ব্যথিত স্বামীজি বলেছিলেন, আমাদের দেশে ধর্ম মানে হল ছোঁয়াছুয়ির বাছবিচার। যে ধর্ম মানুষের কষ্টকে দূর করতে পারে না, তা কোন ধর্মই হতে পারে না।

একই ভাবে 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' (তৃতীয় সংস্করণ ১৪২৮) তৃতীয় খণ্ডের বিষয় স্বামীজি লণ্ডনে দুইমাস থাকার পর আমেরিকায় ফিরে এসে আবার সেখানে যান, সেখান থেকে তিনি ইউরোপ ভ্রমণ করে পুনরায় কলকাতায় ফিরে আসেন, সেই কাহিনি লিপিবদ্ধ হয়েছে। গ্রন্থের ভূমিকাতেই লেখক তাঁর স্বরূপ তুলে ধরেছেন; স্বামীজি একদিকে যেমন জ্ঞানী তেমনি ভক্ত। আবার স্বামী যোগানন্দ বলতেন, শুকদেবের বৈরাগ্য, শঙ্করের জ্ঞান, এবং নারদের ভক্তি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে তাঁর মধ্যে। কাহিনির শুরুতেই কর্মবীর স্বামীজির পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বারেবারে সকলকে বলতেন, কর্ম করতে হবে প্রভুর মতো। ভালবেসে কাজ করতে হবে। যদি প্রেমের সঙ্গে কাজ করা হয় তাহলে তা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 63
Website: https://tirj.org.in, Page No. 530 - 545
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আনন্দের। এরপর দেখা যায় তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে গিয়ে ঠাকুরের জীবন ও সাধনার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, তিনি কোন ধর্মের কথা নিজে মুখে বলেননি। তাঁর উপদেশের মূল কথাই ছিল চরিত্র গঠন করা। তাঁর সম্পর্কে পাশ্চাত্যদেশের বিভিন্ন পত্র – পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। আবার এই প্রসঙ্গে উঠে এসেছে মা সারদার কথা। মা সারদা সম্পর্কে তিনি বলেছেন মা সাক্ষাৎ দেবী সরস্বতী।

এই খণ্ডে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে স্বামীজির কথোপকথন। বলরাম বোসের বাড়িতে শিষ্যদেরকে তিনি বেদের অংশ পাঠ দিচ্ছিলেন। সেই সময় গিরিশচন্দ্র সেখানে এসে বসলে তাঁকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছিলেন, সে তো আর এসব কিছু বুঝলো না, শুধু কেষ্ট – বিষ্টুকে নিয়েই দিন চলে গেল। উত্তরে গিরিশ বলেন, ঠাকুরের কৃপায় বেদ-বেদান্ত মাথায় রেখে সে পাড়ি দেবে। ওসবের আর দরকার নেই। তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের নামে জয়ধ্বনী দিলেন। তারপর তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, দেশের মানুষের এত কষ্ট, যন্ত্রণার কথা কি বেদে লেখা আছে? জগতের দুঃখকষ্টের কথা ভাবতে ভাবতে তাঁর চোখে জল এল। হয়তো তিনি আকুল হয়ে উঠবেন তাই তাড়াতাড়ি ভাব গোপন করে উঠে চলে গেলেন বাইরে। তখন গিরিশচন্দ্র শরৎচন্দ্রকে বলেছিলেন, তাই তিনি তাঁকে এতো ভালোবাসেন তাঁর মহাপ্রাণতার জন্যই। স্বামীজির মহাপ্রাণতার বিস্তারে তাঁর বীরত্বের পরিচয় নিবিড় হয়ে উঠেছে। তাঁর চিন্তাজগতে কাপুরুষতার কোনও স্থান নেই। বীরভোগ্যা বসুন্ধরার মধ্যেই সত্যনিষ্ঠার সৎসাহসই অত্যন্ত জরুরি। স্বামীজি তা নিজের জীবন দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। উপন্যাসগুলিতে সেই বীরত্বের বিস্তার নানাভাবে উঠে এসেছে।

গ. মধ্যবিত্তের দিশারি স্বামী বিবেকানন্দ :

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে জীবনযন্ত্রণা থেকে মুক্তির সন্ধানে আলোকদূত হিসাবে স্বামী বিবেকানন্দ মধ্যবিত্ত বাঙালির অন্তরকে শুধু আলোড়িত করেননি, আলোকিতও করেছিলেন। তার পূর্ণ রূপায়ণ উপন্যাসের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় গুরুপ্রসাদ মহান্তির 'বিলে' (২০১৪) উপন্যাসে। উপন্যাসটি লেখকের জীবনের আধারে বহুমুখী আবেদন সৃষ্টি করেছে। কাহিনির নায়কের নাম বিলে। সে জীবনের সকল সময়ই স্বামীজিকেই একমাত্র অবলম্বন ভাবে। অবচেতন মনে তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী স্বামীজি। লেখক লিখেছেন বিলের জীবন পথের গতিচালকও তিনি। নায়কের সংসারজীবন কষ্টের হলেও, তাঁর অন্তর যখন আনন্দিত হয় তখন সে তাঁকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসতে পারেন। গ্রন্থের সবচেয়ে বড় দিক হল, স্বামীজি যেন লেখকের আত্মার আত্মীয় হয়ে উঠেছেন।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'রসবশে' গল্পে গ্রন্থে বেশ কয়েকটি ছোটগল্পে স্বামীজি স্বমহিমায় উপস্থিত। 'কোথা হইতে হইয়াছে কোথায় পতন' গল্পে তিনি হয়ে উঠেছেন আদর্শের প্রতিমূর্তি। সেই আদর্শের প্রতিফলন দেখা যায় পাশ্চাত্যদেশেও। আমেরিকায় থাকার সময় পাসাডোনায় শেকসপিয়ার নামে এক ক্লাবে স্বামীজিকে একবার এক মহিলা জিজ্ঞাসা করেছিল তাঁর দেশের নারীদের সম্পর্কে তিনি যেন কিছু বলেন। উত্তরে তিনি জানিয়েছিলেন, নারীদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানেন না। তবে ভারতবর্ষ ঘুরে তাঁর উপলব্ধি ভারতীয় নারীর আদর্শ হল তারা মাতৃত্বের প্রতীক। সেইসঙ্গে প্রাচ্যের নারী ও পাশ্চাত্য নারীদেরও তিনি তুলনামূলক আলোচনা করেছেন, যা অতি চিরন্তনরূপে সত্য। তিনি বলেছিলেন, পাশ্চাত্যদেশে নারীদের স্ত্রী-রূপের সমাহার সেখানে স্ত্রীরাই শাসন করে, আর প্রাচ্যদেশে নারীদের মাতৃরূপের সমাহার। সেই মা আমাদের সংসারকে মাথায় করে রাখে। তাই ভারতবর্ষে মায়ের স্থান আগে, পরে স্ত্রীর স্থান। সন্ন্যাসী হয়েও ভারতীয় নারীদের প্রতি তিনি উদাসীন থাকেননি। তিনি জানতেন আমদের সমাজ ও সংসারের প্রকৃত উন্নতি সাধন করতে গেলে নারীদেরকে অবহেলা নয়, তাঁদের যথাযোগ্য সম্মান দিতেই হবে।

আবার 'মদনানন্দ' গল্পে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, মাষ্টার শ্রীম ও নরেনের আলোচনায় উঠে এসেছে মানবচরিত্র ও বর্তমান সমাজ সামাজিকগত দিক থেকে কোন পথে যাছে। এ প্রসঙ্গে তাঁদের আলোচনায় উঠে এসেছে বর্তমান সময়ের যুবসমাজের মধ্যে অনেকেই প্রায় অধঃপাতে যাচ্ছে ও চরিত্র খারাপ হয়ে যাচ্ছে। যদিও এই আলোচনা শ্রীরামকৃষ্ণের পছন্দ হয়নি, তিনি তা বন্ধ করে দেন। এরপর স্বামীজি তাঁদেরকে জানিয়েছেন, তাঁর জীবনেও অনেক স্বপ্ন ছিল। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি ও সমাজ যে পথে চলেছ তাতে তাঁর দুঃস্বপ্নও তাকে ভয় পাইয়ে দেয়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 63
Website: https://tirj.org.in, Page No. 530 - 545
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ঘ. মহাজীবন স্বামী বিবেকানন্দ :

'মহাজীবন' শব্দটি আমাদেরকে সেই জীবনের সন্ধান দেয় যে জীবন চারিত্রিক গুণে, কর্মে, মানবিক ভাবনায় আলোকিত ও সমৃদ্ধ। স্বামী বিবেকানন্দের মহাজীবনকে কেন্দ্র করে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। তাঁর পাঁচ খণ্ডের সুবিশাল 'স্বামী বিবেকানন্দ এক অনন্ত জীবনের জীবনী' (২০১২-২০২০) গ্রন্থটির মধ্যে স্বামীজির মহাজীবনের কথা লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। গ্রন্থের মধ্যে কালের গতিতে স্বামীজির পূর্বপুরুষদের কথা যেমন উঠে এসেছে ঠিক তেমনিই বাংলা দেশের ঐতিহাসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিত্রগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবে ফুটে উঠেছে। একথা অবশ্যই ঠিক গ্রন্থটির উপস্থাপনা রীতি অভিনব। অধ্যায়ের শুরুতে মহামুল্যবান উক্তি দিয়ে অধ্যায়ের গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে। উনিশ শতকীয় সমাজ হতচকিত সমাজ জীবনের পাশাপাশি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহজ, সরল জীবন দর্শনের কথাও লিপিবদ্ধ হয়েছে। ঠিক যেন লেখক প্রথম অধ্যায়ে ক্ষেত্র প্রস্তুত করলেন স্বামীজির আগমনের।

দ্বিতীয় খণ্ডের (২০১৩) শুরুতেই আমরা দেখি ভূমিকায় লেখক লিখেছেন, স্বামীজি ভারত পরিভ্রমণের একমার উদ্দেশ্য দেশের মানুষকে অন্তর থেকে উপলব্ধি করা। সেই উদ্দেশ্যকে ব্যক্ত করতে গিয়েই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রসঙ্গ এনেছেন লেখক। ঠাকুর তাঁকে দেখেই তাঁর মহামানবীয় রূপকে চিনতে পেরেছিলেন। তাই বহুগুণী মানুষের সামনে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথের পরিচয় করাতে গিয়ে বলেছিলেন, দুরন্ত হলেও সে নিত্যসিদ্ধের থাক সে। সংসারের বন্ধনে কখনই সে আবদ্ধ হবে না। শুধু তাই নয়, বেদের হোমাপাখির সঙ্গে ঠাকুর নরেনের তুলনা করবেন। হোমাপাখির চৈতন্য জাগরণ যেমন ঘটে নিজের আত্মবিষ্কারের জন্য, আর নরেন আপামর জনসাধারনের মধ্যে ঘটাবেন চৈতন্যের জাগরণ, আত্মপলব্ধির সঠিক দিশা। তাই অসুস্থ শরীরে তিনি কল্পতরু হয়ে সকলকে অকাতরে কৃপা বিতরণ করেছেন, কিন্তু নরেনকে তিনি মানব জীবনের শিক্ষক রূপে চিহ্নিত করে দিলেন। নরেন শিক্ষা দেবে- এই কথার মধ্যে দিয়েই তিনি প্রিয় শিষ্যের ভবিষ্যৎ জীবনকে প্রকাশিত করে দিয়েছিলেন।

এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডটি (২০১৪) মহাভারতসম হয়ে উঠেছে স্বামীজিকে হৃদয়গম করার ক্ষেত্রে। বিশ্বপথিক সন্ন্যাসী বেরিয়েছেন ভারত পরিক্রমায়, লক্ষ্য হল বনের বেদান্তকে ঘরে আনা। কেননা নরেন জানতেন পরাধীন ভারতবর্ষের অশিক্ষিত, দুর্বল মানুষ গুলোর জীবনে দারিদ্রতাই একমাত্র সম্বল। তাদের জন্যই নরেন্দ্রনাথের ভারত ভ্রমণ। লেখক বলেছেন,

> "নরেন্দ্রনাথ এক 'Leviathan' এর মতো জেগে উঠলেন। এইখান থেকে শুরু হল আমাদের জাতীয়তাবাদের উন্মেষ। ধীরে ধীরে যা স্বদেশী আন্দোলনের চেহারা নিয়ে সারা ভারতবর্ষকে কম্পিত করবে। তখন দেশমাতা হবেন জগন্মাতা। প্রাণ দেবার জন্য শত শত তাজা তরুণ এগিয়ে আসবেন।"[১]

নরেন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে তুলে ধরেছেন সকলের সামনে। তিনি মানুষকে উপলব্ধি করানোর শত চেষ্টা করতেন যে, মানুষের মধ্যে দেবত্ব লুকিয়ে আছে। তিনি নব দর্শন স্থাপন করলেন, আর নিজেকে স্থাপন করলেন বাস্তবের মাটিতে। বোঝালেন তিনটি Capital H আমাদের জীবনের মূলমন্ত্র। সে গুলি হল Head, Hand, and Heart। একথা অবশ্যই ঠিক যে স্বামীজি সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করে ভারত পরিক্রমায় বেরিয়েছেন। কিন্তু তাঁর বাস্তববাদী মন, প্রচলিত ভারতীয় সন্ন্যাসীদের মত ও পথকে তিনি কখনই মানতেন না। হয়তো তাঁর মন্তব্য অনেকের কাছেই ভিন্ন ভাবের মনে হতে পারে। তিনি সকল সময় মনে করতেন সন্ন্যাসী ও গৃহীদের মধ্যে এক সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন। সন্ন্যাসীর শ্রেষ্ঠ প্রতীক শক্তি। ভারতবর্ষে সন্ন্যাসীরা রাজাদের চেয়েও বেশী উচ্চ আসন লাভ করে। বর্তমান সময়ে একথা জানাতে তিনি ভুলেননি যে সন্ন্যাসীরাই এখন জনগণের আত্মরক্ষার অবলম্বন। তাদেরকে লোকশিক্ষক হতে হবে, তাই তাদের আগে শিক্ষিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। স্বামীজি যে চিরশিক্ষক, তিনি যেমন শেখাবেন ঠিক তেমনি নিজেও শিখবেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের রাজারা, উচ্চশিক্ষিত মানুষেরা স্বামীজিকে গুরুর আসনে বসিয়েছিল। আপামর মানুষ মুগ্ধ হয়েছিল স্বামীজির প্রতি। তার কারণ কি? সমগ্র ভারতবর্ষে এমন আর কোন ভারতীয় মহাপুরুষকে সাদরে বরণ করেনি, আর কোন মহাপুরুষকে মাথায়

স্থান দেয় নি। এর কারণ খুঁজতে গেলে আমাদেরকে আশ্রয় নিতে হবে স্বামী তুরীয়ানন্দের লেখা স্বামীজি সম্পর্কে একখানি পত্রের, সেখানে তিনি বলেছিলেন, আসল হল ব্যাক্তিত্ব। কারণ ব্যাক্তিত্বকে অবলম্বন করেই কয়েকটি মানুষই জগৎ চালায়।

'স্বামী বিবেকানন্দ এক অনন্ত জীবনের জীবনী' গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে (২০১৫) আমরা দেখব তিনি সেই মনুষ্যত্বের জাগরণ ঘটিয়েছেন। খণ্ডটি উপনিষদসম। এই খণ্ডে বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দ তাঁর পাশ্চাত্য যাত্রাকে সার্থক করেছেন। বিশ্বধর্ম সম্মেলনে তিনি ভারতবর্ষকে সকলের হৃদয় সিংহাসনে স্থাপন করলেন। তাঁর অন্তরের বিশ্বাসে, গুরুমা ও গুরুদেবের প্রতি শ্রদ্ধায় মানবতার জাগরণ ঘটালেন। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে ঈশ্বরের অবস্থান, তা তিনি সুনিশ্চিত করলেন। তিনি তাঁর অনন্ত ধৈর্য, অনন্ত অধ্যবসায়, আর অনন্ত পবিত্রতা দিয়ে শিকাগো ধর্মমহাসভায় সিদ্ধিলাভ করলেন। তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সমালোচক বলেছেন;

> "বিবেকানন্দের মতো এত বিরাট ব্যক্তিত্ব নিয়ে (আমেরিকার মাটিতে) কেউ দাঁড়াতে পারেননি... তাঁর অতিমানবীয় জ্ঞানবুদ্ধি ঔৎকর্ষের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের আধ্যাপকদের শিশু মনে হত... এই মহৎ ঝঞ্ঝাসদৃশ হিন্দু পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দিয়ে গেছেন।"[২]

এই কথা সত্য হয়েছিল, ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩, বিশ্ব ইতিহাসে এক বিশেষ দিন, ভারতবর্ষের ইতিহাসেও বিশেষ দিন। শিকাগোর আর্ট ইনস্টিটিউটে ধর্ম মহাসম্মেলন শুরু হল। স্বামী বিবেকানন্দ মঞ্চে বসে আছেন স্থির চিত্রের মতো। মাথায় কমলা রঙের উষ্ণীষ, বর্ণোজ্জ্বল লাল পোশাকে যেন রাজকীয় দ্যুতি প্রকাশ হচ্ছে। স্বামীজি বক্তৃতা মঞ্চে বলার সময় দেবী সরস্বতীকে প্রণাম জানিয়ে তাঁর বক্তব্যকে উপস্থাপন করলেন, এবং হাজার হাজার শ্রোতার হৃদয়ে স্থান করে নিলেন। সমগ্র শিকাগো তাঁর বিজয় বার্তায় উল্লাসিত হয়ে উঠল। পত্র-পত্রিকায় স্বমীজির শুধু প্রশংসা আর প্রশংসা। তিনি হয়ে উঠলেন বিশ্বধর্ম সম্মেলনের প্রাণপুরুষ। তিনি হয়ে উঠলেন অগণিত মানুষের কাছে দৈবীপুরুষ। তিনি হয়ে উঠলেন চিরকালের চিরন্তন বাণীর শ্রেষ্ঠ কণ্ঠস্বর। ভারতপ্রেমিক সন্ন্যাসী হয়ে উঠলেন বিশ্বপ্রেমিক। সমগ্র ধর্মসম্মেলনের তিনি হলেন সবথেকে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। আমেরিকার প্রতিটি মানুষের মনে তিনি তাঁর রাজকীয় ছাপ রেখেছিলেন। তাঁর জাগরণী মন্ত্রে শত শত মানুষ নিজের আত্মশক্তির জাগরণ ঘটাতে পেরেছিল। প্রখ্যাত সাংবাদিক ও লেখিকা এলা হুইলার উইলকক্স স্বামীজিকে দেখে ভেবেছিলেন, তিনি বুদ্ধ বা খ্রিস্ট। তাঁর মধ্যে ফুটে উঠে পবিত্রতা ও নিষ্ঠা। লৌকিক-অলৌকিকের গন্ডি ছাড়িয়ে তিনি মহামানব হয়ে উঠলেন। সকলের অন্তরদৃষ্টি খুলে দিতে চাইলেন। তিনি যেমন সমগ্র আমেরিকাবাসীদেরকে আহ্বান করলেন, ঠিক তেমনি সাগরের ওপার থেকে স্বদেশবাসীদেরকেও আহ্বান করে বললেন, দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হবে, কর্মে উদ্দীপ্ত হতে হবে। তিনি সকল সময়ই চাইতেন মানুষ আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে উঠুক। স্বামীজি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাবধারাক মিলিত করে এক অভিনব সমন্বয় স্থাপন করেছিলেন। প্রাচ্যের মহান মানুষটি হলেন বাংলাদেশের প্রাণপুরুষ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব। আর পাশ্চাত্যের ভগিনী নিবেদিতা হলেন তাঁর একান্ত অনুরাগী। তাঁর কাছে তিনি ছিলেন আদর্শের প্রতিমূর্তি। এ সম্পর্কে মনে পড়ে যায় কিপলিং এর মন্তব্যকে। তিনি বলেছিলেন, East East থাকবে, West West থাকবে, তাদের মধ্যে মিলন হবে না। কিন্তু স্বামীজির কাছে অসাধ্য বলে কিছু নেই। তিনি দেখিয়ে দিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন সম্ভব। জ্ঞানের জগতে পূর্ব-পশ্চিম বলে কিছু হয় না। যা গ্রহণীয় তা সকলের কাছেই আদরণীয়।

স্বামীজি পাশ্চাত্য দেশে আছেন, কিন্তু মন-প্রাণ পড়ে আছে দেশজননীর প্রতি। তিনি যে কতবড় দেশপ্রমিক ছিলেন তা বোঝা যায় তাঁর দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি ভালোবাসায়। প্রতি মুহূর্তে তাঁর দেশমাতৃকা ছিল শ্বাস ও প্রশ্বাসের মতো। সকল দেশের সেরা স্বামীজির জন্মভূমি সেকথা তিনি সুদূর আমেরিকাতে বসেও ভুলতে পারেননি। পাশ্চাত্য দেশের বৈভব স্বামীজিকে নিজের দেশ সম্পর্কে বিস্মৃত করেনি। পাশ্চাত্য দেশের মানুষের ভালোবাসা স্বামীজিকে নিজের দেশের জনসাধারণকে ভুলতে দেয়নি। তিনি প্রাচুর্য ভরা দেশে আছেন, আর ভাবছেন স্বদেশবাসীর কথা। লিখছেন,

> "ভারতের মানুষের দারিদ্র আর অজ্ঞতা দেখে আমার ঘুম হয় না। Cape comrin, মা কুমারীর মন্দিরে বসে, ভারতবর্ষের শেষ পাথর-টুকরোর উপর বসে (ভাবছিলুম) এই যে আমরা এতজন সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, লোককে meta physics (দর্শন) শিক্ষা দিচ্ছি, এসব পাগলামি। 'খালি পেটে ধর্ম

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 63
Website: https://tirj.org.in, Page No. 530 - 545
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হয় না, -গুরুদেব বলতেন না? ওই যে গরিবগুলো পশুর মতো জীবন যাপন করছে, তার কারণ মূর্খতা; পাজি বেটারা চার যুগ অদের রক্ত চুষে খেয়েছে। আর দু'পায়ে দলেছে।"[৩]

স্বামীজি দেখেছেন তার স্বদেশের করুণ জীবনের দিনলিপি। তার কারণ সম্পর্কে তিনি যা বললেন তা বিস্মিত করে, তাঁর আগে এভাবে কোন মহাপুরুষ ভাবতে পারেননি। তবে স্বামীজি একথাও বলেছেন যে, এর মধ্যেও ভারতের যে আধ্যাত্মিক সম্পদ আছে তা অন্যদেশে বিরল। ভারতবর্ষের মোক্ষ আছে, মোক্ষমার্গের মধ্যেই ভারত অন্য সকলকে দিশা দেখাবে।

এই গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডটি (২০২০) স্বামীজির জীবনের বেদ স্বরূপ। তিনি বলেছিলেন তাঁর নিজস্ব কিছু বলার আছে। তা তিনি নিজের ভাবেই বলবেন। সাইক্লোন হিন্দু সন্ন্যাসী নিজস্ব আত্মদর্শনে সমগ্র পাশ্চাত্য জগতকে তাঁর নিজের কথা বললেন। আলাসিঙ্গাকে তিনি লিখছেন দুটি কেন্দ্র খুলবেন কলকাতায় ও মাদ্রাজে। স্বদেশে ফিরেই স্বামীজি বহুজনহিতায়চ বহুজনসুখায়চ ভাব ধারায় মগ্ন হবেন তা বোঝ যাছে। দেশের মানুষের কি করলে মঙ্গল হবে, কি করলে তারা মানুষের মতন মানুষ হয়ে বাঁচতে পারবে, সেই চিন্তা সকল সময় স্বামীজিকে তাড়িত করত।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব ছিলেন স্বামীজির কাছে দেবতা সমান। তাঁর সম্বন্ধে তিনি অনেক কথা বলেছেন। বক্তৃতা দিয়েছেন, ঠাকুর স্বামীজির সকল সময়কাছে কাছেই আছেন, তা তিনি বিশ্বাস করতেন। তাঁর বিভিন্ন চিঠিপত্রে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। এবং নিজেও ছিলেন নিজের আদর্শে একক। সেখানে তিনি কখনও সমঝোতা করেননি। তিনি সকল সময়েই নিজের অবস্থান থেকে সরে আসেননি। তাঁর এই অনমনীয় মনোভাবের পরিচয় দেখা যায়, বিভিন্ন শিষ্যকে লেখা চিঠিপত্রে।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলতেন নরেন জগৎ কাঁপাবে। সে ভেলকি লাগিয়ে দেবে। এই খন্ডে দেখা যাবে আমেরিকা থেকে লন্ডন স্বামীজি কাঁপিয়ে দিয়েছেন। তাঁর আশ্চর্য জ্ঞান,পাণ্ডিত্য, মনীষা, তাঁর বক্তৃতা সকলকেই মুগ্ধ করতো। শ্রীমতী বার্ক বলেছেন, 'স্বামীজির পান্ডিত্য এবং যুক্তিতর্কের দক্ষতা যেমন ছিল অপরিসীম, তেমনি ছিল তাঁর আধ্যাত্মিক প্রেরণাশক্তি। তিনি যেমন অতি তীক্ষ্ণধী তার্কিককেও তর্কে পরাস্ত করতে পারতেন, তেমনি খুব সন্দেহবাদী মানুষেরও মন জয় করতে পারতেন। তিনি তাঁর ক্লাসে বা ভাষণে অতি সহজ ভাষা প্রয়োগ করতেন। কারণ মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল–সূক্ষ্ম অদ্বৈত তত্ত্বকে প্রাত্যহিক জীবনের উপযোগী জীবন্ত, কবিত্বময় করতে হবে।[৪]

দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি স্বামীজির ছিল অগাধ ভালবাসা। ঠিক তেমনি সকল দেশের মানুষের প্রতি ছিল তাঁর ঐকান্তিক শ্রদ্ধা। তাই স্বামীজি বলেছেন, এবার তাঁর কর্মের গন্তব্যস্থল হবে ভারতবর্ষ। স্বদেশবাসীকে তিনি অন্তর থেকে ভালোবেসেছেন, শ্রদ্ধা করেছেন নরনারায়ণদের। জীবনযুদ্ধের জয়ী সৈনিকের মন–প্রাণ নিবেদিত সেই নরনারায়ণদের জন্য। এই খণ্ডটি আর এক কারণে বিশেষ কৃতিত্ব দাবী করে। প্রচলতি ধ্যান–ধারণা অনুযায়ী অনেকেই মনে করেন যে স্বামীজি পাশ্চাত্য দেশে গিয়ে সেরকম ভাবে গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কে নিয়ে সে রকম কোন কথা বলেননি। কিন্তু এই গ্রন্থে লেখক দেখিয়েছেন এই মন্তব্যের সত্যতা নেই। হয়তো স্বামীজি যেখানে ঠাকুরের কথা বলা প্রয়োজন মনে করেছেন, সেখানেই গুরুমা সারদাদেবী ও ঠাকুরের কথা বলেছেন। স্বামীজি সুদূর বিদেশে বসেও মঠের গুরুভাইদের জানাচ্ছেন যে, ঠাকুরের সেবা নয়, তাঁর সন্তানদের যারা সেবা করবে, ঠাকুর তাদের দেহে অবস্থান করবেন। তাদের মুখে দেবী সরস্বতী অবস্থান করবেন, তাদের বক্ষে মহামায়া মহাশক্তি দান করবেন। নিউইয়র্কের অন্যতম সংবাদপত্র 'দি নিউইয়র্ক হেরাল্ড' এ স্বামীজি সম্পর্কে খবর প্রকাশিত হয়, সেখানেও উল্লেখ হয় গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। বলা হয়, স্বামীজি নিজের কথা খুব একটা বলেন না, মাঝে মাঝে বলেন তাঁর গুরুদেবের ভাবই তিনি পাশ্চাত্য দেশে প্রচার করতে এসেছেন। স্বামীজি গুরুভাইদের জানাচ্ছেন যে যদি ঠাকুরকে কেউ অবতার বলে মানে তবে উত্তম কথা, আর যদি না মানে তবেও উত্তম কথা। অর্থাৎ তিনি অন্তর থেকে বিশ্বাস করেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব নররূপী নারায়ণ। লোকে মানা না মানাতে কিছু আসে যায় না। বিদেশে থেকেও স্বামীজির ভাবেন ঠাকুরকে যেভাবেই হোক একটি স্মৃতি সৌধে প্রতিষ্ঠা করতে হবে, তিনি এক আলো যা দেশ থেকে বিদেশের সমস্ত জনসাধরণকে জীবন পথে চলার দিশা দান করবেন। স্বামীজি চেয়েছেন এখন জ্যন্ত দেবতার পূজা হোক। ঠাকুর সম্পর্কে তাঁর ধ্যান ধারণা উজাড় করে দিয়েছেন। মা সারদামণি সম্পর্কেও স্বামীজির ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা। একথা বলা যেতে পারে ঠাকুরের চেয়েও স্বামীজি শ্রীমাকে অধিক মানতেন। গুরুভাইদের তিনি জানিয়েছিলেন, ঠাকুরের কৃপার চেয়েও তিনি মা সারদার আশীর্বাদকে বড় মনে করেন। মা সারদাই তাঁর কাছে মাতৃভূমী

হয়ে উঠেছিলেন। গ্রন্থের খণ্ডটি শেষ হয়েছে পাশ্চাত্য জয় করে স্বামীজি এবার ফিরে যেতে চান নিজ মাতৃভূমি ভারতবর্ষে। তাঁর স্বপ্নের ভারতবর্ষ।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'প্রথম আলো' (২০১০) উপন্যাসে স্বামী বিবেকানন্দ বাস্তবতার আলোকে আলোকিত হয়েছেন। তবে একথা অবশ্যই ঠিক সেখানে লেখকের কল্পনার মাধুর্য স্থান পেয়েছে। দুই খণ্ডের উপন্যাসে বাংলাদেশের সামাজিক, ধর্মনৈতিক, সাংস্কৃতিক পটপরিবর্তন তথা নবজাগরণের ও দেশাত্মবোধের ভাবধারা যেমন স্থান পেয়েছে, ঠিক তেমনি বাংলাদেশের মহামানবেরাও এই উপন্যাসে উঠে এসেছেন। স্বামীজিও ভিন্ন ভাবাধায়ার উঠে এসেছেন। কাহিনির মধ্যে দেখা যায়, তিনি সময়ের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেননি, জীবন সম্পর্কে চিন্তা ও চেতনা তাঁকে সকল সময় ব্যাকুল করে তোলে। সেই ব্যাকুলতার উপসম হয় যখন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্য পান। ঠাকুরের দেখা পেলেও তাঁর মন বিদ্রোহী হয়ে থাকে। সেই বিদ্রোহী মন শান্ত হয়ে যায় ঠাকুরের ভালোবাসায় ও স্নেহে। কিন্তু নরেন মাঝে মাঝে অস্বস্তিতে পড়ে যায় ঠাকুরের কথায়। তাঁর প্রশংসা করতে গিয়ে ঠাকুর বলেছেন, কেশবচন্দ্রের চেয়ে নরেনের শক্তি প্রায় ষোলোগুণ বেশি। ঠাকুরের এই কথাতে সে খুশি হয় না, বরং প্রতিবাদ করে ওঠে, কোথায় জগৎবিখ্যাত কেশব সেন আর কোথায় সে? মাঝে মাঝে নরেনের মনে প্রশ্ন জাগে ঠাকুর যে তাকে এত বড় করে দেখে, সে কি তার যোগ্য? এই সহজ সরল মানুষটির প্রত্যাশা সে পূরণ করতে পারবে তো? সংসারের নিদারুণ দায়িত্ব এসে পড়ে পিতার মৃত্যুর পর। বিদ্যাসাগর মশাইয়ের স্কুলে সে হেডমাস্টারের চাকরি পেয়েছিল। কিন্তু স্কুলের সেক্রেটারীর সাথে মতান্তরে তাঁর চাকরি গেল। মা-ভাইদের দুঃখকষ্ট দূর করার জন্য সে ঠাকুর জানায়। ঠাকুর বলে মা ভবতারিণীর কাছে গিয়ে সে যা চাইবে তাই পাবে। নরেন ঠাকুরের কথায় গেল মায়ের মন্দিরে। প্রদীপের মৃদু আলোয় মনে মা ভবতারিণী হাসছেন। হাতজোড় করে সে বলে উঠল মা। এই ডাক যেন সমস্ত জাগতিক সত্যের প্রতীক হয়ে রইল।

অন্যদিকে উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডে স্বামীজির আমেরিকায় শিকাগো ধর্মমহাসভার যাওয়ার কথা স্থান পেয়েছে। ধর্মমহাসভায় তিনিই সর্বকনিষ্ঠ প্রতিনিধি। এরপরেই লেখক ফিরে গেছেন তাঁর ভারতভ্রমণের কাহিনিতে। যে ভারতভ্রমণে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ধর্মের প্রকৃত স্বরূপকে। ধর্ম মানে কুসংস্কারে গন্ডিতে আবদ্ধ থাকা নয়। প্রকৃত ধর্ম হল দেশ ও দশের দারিদ্র্য দূর করা, অসহায়, নিপীড়িত মানুষের সেবা করা। তিনি বুঝেছিলেন এই নিঃস্ব, রিক্ত ভারতবর্ষের উন্নতি করতে হলে প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের মিলন প্রয়োজন। কেননা, পাশ্চাত্য তাঁদেরকে অন্ন দেবে, ভারতবর্ষ তাঁদের মানসিক শান্তি দেবে। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই তিনি গিয়েছিলেন আমেরিকায় ধর্মমহাসভায়। সেখানে তাঁর কথায় উপস্থিত সকল শ্রোতাদেরকে উজ্জীবিত করেছিল। এই ধর্মমহাসভার সাফল্যের পরেই অনেকেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল। তার মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য হলেন জোসেফিন ম্যাকলাউড। ম্যাকলাউড গরব করে বলতেন, যেদিন তিনি প্রথম স্বামীজিকে দেখেছেন, সেদিন থেকেই তার নবজন্ম হয়েছে। ইংল্যান্ডে গিয়েও তিনি পেলেন তাঁর শিষ্যা মিস মার্গারেট নোবেলকে। যিনি তাঁর আদর্শে নিজেকে গড়ে তুলবেন ভগিনী নিবেদিতা রূপে। স্বামীজির আদর্শে, ব্যক্তিত্বে নিবেদিতার জন্মান্তর ঘটে গেছে। পূর্ব সংস্কার সরে গেছে। তাঁর পরিবর্তন ঘটে গেল, ছিলেন শৈব, হলেন শাক্ত। মায়ের মানত রক্ষার জন্য গেলেন কালীঘাটে। দক্ষিণেশ্বরের দরজা তাঁর জন্য বন্ধ হয়ে গেছে, তিনি শূদ্র হয়ে সন্ন্যাসী হয়েছেন এই তাঁর অপরাধ। কিন্তু মাকালীকে তিনি অন্তর দিয়ে ভালোবাসেন। তাঁর মধ্যে ছিল সর্বধর্ম সমন্বয়ের ভাব। হিন্দু মুসলিম তাঁর ভিন্ন নয়, এক ও একাকার। মানুষই ছিল তাঁর কাছে সত্য। দুই ধর্মের জাগরণ দরকার ভারতবর্ষকে জাগাতে হলে। বেদ-বাইবেল-কোরানের মূল কথাই হল মানবধর্ম। তিনি বলেছিলেন মানবতার কথা। ভারতবর্ষের উন্নতি করতে গেলে হিন্দু ও মুসলিম এই দুই ধর্মের মহান আদর্শকে সামনে রেখেই করতে হবে।

স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে বাংলা কথাসাহিত্যে রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হল– 'সরলা ও সন্ন্যাসী ঠাকুর বাড়ির ঝরাপাতা ও বিবেকানন্দ' (২০১৮), 'প্রাণসখা বিবেকানন্দ' (অখণ্ড ২০১৯)। এই দুই গ্রন্থে স্বামীজি ভিন্ন ভাবে ও ভিন্নরূপে উঠে এসেছেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর আবেদন যে বহুমাত্রিক সে কথা সম্পূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন লেখক। 'সরলা ও সন্ন্যাসী ঠাকুর বাড়ির ঝরাপাতা ও বিবেকানন্দ' গ্রন্থে স্বামী বিবেকানন্দ ও ঠাকুরবাড়ির বিদুষী কন্যা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাগ্নি সরলা দেবীকে কেন্দ্র করে এক অতুলনীয় কাহিনির অবতারণা করা হয়েছে। উপন্যাসের মধ্যে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 63
Website: https://tirj.org.in, Page No. 530 - 545
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেকখানি অংশ জুড়ে আছেন। কিন্তু কাহিনীর গতিপথ বিবেকানন্দকে কেন্দ্র করে। বিশ্বজয় করে তিনি সকলের কাছে এক বিস্ময় হয়ে উঠেছেন। সরলা দেবীর কাছেও তিনি হয়ে ওঠেছেন ভিন্ন ভাবের প্রতিমূর্তি। সে অনুভব করে স্বামী বিবেকানন্দকে অনেকেই বুঝতে ভুল করেছে, তার মধ্যে অন্যতম তাঁর মামা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। উপন্যাসে লেখক বলেছেন রবীন্দ্রনাথ স্বামীজি সম্পর্কে ভিন্ন মতামত দান করেছেন। স্বামীজির যে ভক্তিভাব তা তাঁর চোখে কখনোই দেশের একমাত্র মঙ্গলের উপায় হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের আপত্তির কারণ স্বামীজি তাঁর গুরু রামকৃষ্ণের প্রবর্তিত পথে দেশকে দেখতে চাইছেন। আধ্যাত্মিকতা আধুনিক ভারতের একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে না। কিন্তু স্বামীজি যে আধ্যত্মিকতাকে গ্রহণ করেছিলেন তার মধ্যে ছিল আধুনিক চিন্তা ও চেতনার উত্তরণের উপায়। মানবতার চিরন্তন সত্যকে প্রকাশ করার প্রয়াস।

অন্যদিকে স্বামী বিবেকানন্দের মহিমান্বিত মহাজীবনের প্রকাশ লক্ষ করা যায় রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'প্রাণসখা বিবেকানন্দ' (২০১৯) উপন্যাসে। উপন্যাসটি ভাবে ও ভাষায় যে সম্পূর্ণরূপে অভিনবত্ব তা বোঝা যায় উপন্যাসের প্রাক্কথাতে। লেখক বলেছেন,

> "এই পরিণত বয়সে এসে শেষপর্যন্ত সাহস হল সেই প্রেম নিয়ে লিখতে একটি উপন্যাস, যে প্রেম ছেয়ে আছে সমস্ত ভুবন, যে-ভালোবাসা শাশ্বত চিরায়মান। যে-প্রেমের চেয়ে বড় প্রেম আমি অন্তত ভাবতে পারি না। ...প্রাণসখা বিবেকানন্দ এমন এক প্রেমের গল্প অনন্ত যার প্রততি, অমেয় যার পুণ্যতা।"[৫]

কাহিনী শুরু হয়েছে স্বামীজির জন্মের কথা দিয়ে। ভাষার গুণে ও উপন্যাসের প্রতিটি অধ্যায়ের শিরোনামে তাঁর কথাকে লেখক চমকীয় ভাবে প্রকাশিত করেছেন। যদিও তথ্যের চেয়ে আবেগ বেশি ফুটে উঠেছে। কাহিনীকে ভিন্নরূপ দান করার জন্য লেখক মাঝে মাঝে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথাকে তুলে ধরেছেন। যেমন, ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা। আর সেই বৈঠক প্রবেশ করবে নরেন্দ্রনাথ। ঠাকুর ও তাঁর হৃদয় অভিন্ন। উপন্যাসে সেই অভিন্ন হৃদয়ের কথা প্রকাশিত। নরেনের মনে হয়েছে ঠাকুর এক অপার সমুদ্র। যার কোন তল নেই। ঠাকুরের সান্নিধ্যেই সে নিজেকে আবিষ্কার করল, সত্যের প্রকৃত স্বরূপকে সে খুঁজে পেল।

উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয়, স্বামীজির পরিব্রাজক জীবন ও শিকাগো ধর্মমহাসভায় নববেদান্তের প্রচার। তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করে উপলব্ধি করেছিলেন জীবনের সকল কিছুই কর্মের মধ্যে নিহিত আছে। সেই কর্মেই ভারতবর্ষ নবভাবে, নবরূপে সেজে উঠবে। রামনাদের ভাস্কর সেতুপতি তাঁকে অনুরোধ করলেন, তিনি যেন আমেরিকা যান। আমেরিকার শিকাগো ধর্মমহাসভায় প্রতিনিধত্বও করতে পারেন। স্বামীজি হয়তো শোনাবেন সমগ্র পাশ্চাত্যদেশকে আধ্যাত্মিকতার মহানমন্ত্র। ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের আদেশে তিনি মনস্থির করলেন আমেরিকার শিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদান করবেন। ১৮৯৩ এ ৩১ মে তিনি রওনা দিলেন অজানা পথের উদ্দেশ্যে। তৃতীয় খণ্ডে স্বামীজি নবমানবতার মন্ত্রকে ছড়িয়ে দিয়েছেন সমগ্র বিশ্বে। শিকাগো ধর্মমহাসভায় যে বিজয়ের সূচনা তিনি করলেন, তার মধ্যে দিয়েই পাশ্চাত্যবাসী উপলব্ধি করল ভারতবর্ষের প্রাণশক্তিকে ও আধ্যাত্মিক শক্তিকে। শিকাগো ধর্মমহাসভায় পাশ্চাত্যবাসীদের হৃদয় তিনি যেমন জয় করলেন, ঠিক তেমনি তিনি উপলব্ধি করলেন তাঁর সামনে বিপুল কর্ম পড়ে আছে। স্বামীজি জানেন, তাঁর কর্মের কাণ্ডারি হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি জীবনে যে কর্ম করেছেন, সেই কর্মের মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে আশাবাদের কথা। স্বামী প্রেমানন্দকে তিনি বলেছিলেন বেলুড় মঠে যে অধ্যাত্মিক শক্তির জাগরণ হয়েছে, তা বছরের পর বছর চলবে। সেই কথা আজ চিরসত্য হয়ে উঠেছে। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তিনি বলেছিলেন, আর একজন বিবেকানন্দ থাকলে জানত এই বিবেকানন্দ কি করে গেল।

শংকরের 'আমি বিবেকানন্দ বলছি' (২০১০) গল্পগ্রন্থের কথক স্বামীজি নিজেই। ভূমিকায় লেখক বলেছেন,

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 63
Website: https://tirj.org.in, Page No. 530 - 545
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "আর যা বিস্ময়ের, ঊনচল্লিশ বছর পাঁচ মাস চব্বিশ দিন–এর সংক্ষিপ্ত জীবনে সংখ্যাহীন বাধাবিপত্তি ও বিড়ম্বনা সত্ত্বেও এক মহাজীবনের অবিস্মরণীয় নায়ক হয়ে উঠেছেন আমাদের পরমপ্রিয় স্বামী বিবেকানন্দ।"[৬]

গ্রন্থের প্রথম গল্পটি 'আমার ছোটগল্প'। স্বামীজি নিজমুখে তাঁর বাল্যজীবনের কথা বলেছেন। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর মায়ের কথা এসেছে। তাঁর জীবনে ধর্মীয় সংস্কৃতি রূপ ও আবেগ রয়েছে, সেখানেও মায়ের অবদান সবচেয়ে বেশি। তিনি মুক্তকণ্ঠে বলেছেন, তাঁকে বিবেকানন্দ রূপে গড়ে তোলার জন্য সবচেয়ে বেশি অবদান তাঁর মায়ের। মায়ের ত্যাগ ও আদর্শের কথা বলেছেন। ভারতীয় সমাজ জীবনে এই ত্যাগ, আদর্শের জন্যই আমরা মায়েদের দেবীজ্ঞানে পূজা করি।

পরের গল্পের নাম হল 'শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে পরিচয়'। যৌবনে পদার্পণের দিনগুলিতে জীবনের সত্যের উদ্দেশ্যে আকুল হয়ে উঠেছিলেন। ঠিক সেই সময়ে তিনি দেখা পেলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের। ঠাকুরের আদর্শে নিজের জীবনকে তিনি গড়ে তুললেন। ঠাকুরের স্নেহ, ভালোবাসায় তিনি জীবনের সত্যকে উপলব্ধি করলেন। দক্ষিণেশ্বরের সেই মধুর দিনগুলো তাঁর আত্ম আবিষ্কারের দিন, সে কথা স্বামীজি মুক্ত কণ্ঠে বলেছেন। তিনি জীবনে প্রথম শুনেছিলেন যে একজন মানুষ বলেছেন তিনি ঈশ্বর দর্শন করেছেন, এর আগে এই কথা কেউ বলতে পারে নি সাহস করে। ঠাকুর বলেছিলেন। ঠাকুরের এই উক্তি তাঁর পটপরিবর্তন ঘটে গেল। তিনি এই প্রথম উপলব্ধি করলেন বাস্তব সত্যকে। তৃতীয় গল্পের নাম 'শ্রীরামকৃষ্ণই আমার প্রভু'। এই কাহিনিতে স্বামীজি প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনকথা ও মা সারদার কথাও বর্ণনা করেছেন। ঠাকুরের বিভিন্ন সাধনার কথা স্থান পেয়েছে। ঠাকুর যে অবতার পুরুষ, কিন্তু তিনি মানবত্বের সীমা পার হতে দেন নি, সেই কথাই তিনি গল্পে বলেছেন। প্রভুর মহিমা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, ঠাকুর জগতের মঙ্গলের জন্যই এসেছিলেন। স্বামীজির মতে যেদিন ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেছেন সেইদিন থেকেই আধুনিক ভারতের সূচনা। তিনি মুক্তকণ্ঠে বলেছেন ঠাকুর বলতেন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে সারবস্তু রয়েছে তার প্রকাশেই জগতের মঙ্গল। মানবজাতির কল্যাণের জন্য চাই ত্যাগ। সেই ত্যাগেই মানুষকে আত্মপ্রত্যয়ী করে তোলে।

আলোচ্য গ্রন্থের পরের গল্পের নাম 'আদি মঠ বরানগর এবং আমার পরিব্রাজক জীবন'। কাহিনিতে স্থান পেয়েছে ঠাকুরের দেহত্যাগের পরে নরেনসহ সকল সন্ন্যাসীবৃন্দের জীবন। অতি কষ্টের মধ্যে সেইসব দিন তাঁরা অতিবাহিত করেছিলেন। নিজের সংসারের সকল দায়িত্ব ছিল স্বামীজির উপর। একদিকে মঠ ও অন্যদিকে মা–ভাইদের চিন্তা। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন ঠাকুরের ও মা সারদার আশীর্বাদে তাঁদের কোন অসুবিধা হবে না। ত্যাগের মধ্যে দিয়েই একদিন তাঁরা একদিন সকল বাধা দূর করবে। এই ভাবধারা একদিন সমগ্র ভারতবর্ষকে আলোকিত করে তুলবে ও জাতির কল্যাণ হবে।

গল্পগ্রন্থটির পরের গল্প 'দৈব্য আহ্বান ও বিশ্বধর্মসভা'। এই গল্পেই স্বামীজি বলেছিলেন, তিনি যখন পুনরায় ফিরে আসবেন, তখন বোমার মতো ফেটে পড়বেন। আর সমাজ তাঁকে অনুসরণ করবে। একথাও জানিয়েছিলেন তিনি মুক্তি কামনা করেন না, ভক্তিও তাঁর প্রয়োজন নেই, শুধু প্রভুর বাণীকে জগতের কাছে প্রচার করবেন। তিনি বলেছেন তাঁর জীবনের ব্রত কি, তা তিনি জানেন। তিনি যেমন ভারতের, তেমনি সমগ্র জগতের। তিনি অনুভব করতেন তাঁর পিছেন এমন এক শক্তি আছে, যে শক্তি মানুষ, শয়তান ও দেবতার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। স্বামীজি জানেন তাঁর আমেরিকা যাত্রা তাঁর নিজের ইচ্ছায় বা অন্য কোন ব্যক্তির ইচ্ছাতে নয়। যিনি ভারতের ঈশ্বর, যিনি সকল অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রন করছেন, তাঁর ইচ্ছায় সম্ভব হয়েছে। আমেরিকায় গিয়ে তাঁর কষ্টের দিনগুলি তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি সকল সময় বুঝতে পারতেন প্রভু রামকৃষ্ণ তাঁর সঙ্গেই আছেন। প্রভুর যা ইচ্ছা তাই পূর্ণ হবে। জগতের জন্য তিনি মহৎ কাজ করবেন, নাম-যশের জন্য আকুলিত হবেন না। ধর্মমহাসভায় তিনি ভারতবর্ষের নামকে উজ্জ্বল করলেন। পাশ্চাত্যদেশ জয় করেও তিনি তাঁর পরিচয় দিয়েছেন সন্ন্যাসীরূপে। এই পরিচয়ই ছিল তাঁর একমাত্র অহংকার। প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণের যে ইচ্ছা তাতেই তাঁর সারা জীবনের গর্ব। গল্পের মধ্যে তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি অচলা ভক্তি বারেবারে প্রকাশিত হয়েছে।

অন্যদিকে 'ঘটনার ঘনঘটা' গল্পে স্বামীজির আমেরিকা বসবাসের দিনগুলোর কথা উঠে এসেছে। এখানে উল্লেখ্য, তিনি বিশেষভাবে প্রশংসা করেছেন আমেরিকার নারীদের। তারা যেমন পবিত্র, তেমনি স্বাধীন, আবার স্বাপেক্ষ ও দয়াবতী।

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 63
Website: https://tirj.org.in, Page No. 530 - 545
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মেয়েরাই এদেশের সকল কিছু। বিদ্যা, বুদ্ধিতে তারা অনেক উন্নত। এদেশের বরফ যেমন স্বচ্ছ, ঠিক তেমনি এদেশের মেয়েরা পবিত্র। তবে তিনি ব্যথিত হয়েছেন তাঁর সম্পর্কে একদল নিন্দাকারী মিথ্যা কুৎসা রটনা করেই চলেছে। কিন্তু তিনি তার জন্য চিন্তিত নন, লোকে কি বলল, তাতে তাঁর কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। তিনি সগর্বে ঘোষণা করেছেন, তিনি তাঁর দেশ ও জাতিকে তিনি ভালোবাসেন। প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ সকল সময় তাঁর সঙ্গে। তাঁর জীবনে একমাত্র সত্য হল প্রেম ও সহানুভূতি। তাঁর হৃদয়ের একমাত্র উপাসনা হল ভালবাসা। তাই প্রতাপ মজুমদার ও গোঁড়া পাদ্রীরা তাঁর নামে নামে মিথ্যা কুৎসা প্রচার করলেও তাতে তাঁর কিছু আসে যায় না। তিনি শুধু ঈশ্বরের প্রার্থনা করেছেন তাঁদের যেন চৈতন্য হয়। মিথ্যা প্রচারে ব্যথিত স্বামীজি জানালেন তিনি প্রকৃত অর্থেই সন্ন্যাসী। তিনি প্রতারক নন। তিনি সকল সময়ই মনে করতেন তাঁর জীবনের বড় দোষ হল তিনি ভারতবর্ষকে ভালোবেসেছেন।

গ্রন্থের পরের গল্প হল 'ভারতে ফিরে এলাম'। স্বামীজি বিশ্বাস করতেন নেতা গড়ে ওঠে না, নেতারা জন্মায়। তিনি স্বদেশে ফিরে এসেছেন জগতের, মানবতার ও মানবজাতির নেতা হয়ে। তিনি স্বদেশের মানুষকে প্রভু যীশুর মতই তিনি জানিয়েছিলেন, তাঁর বাণীই হচ্ছে তাঁর আত্মা ও জীবন। অসুস্থ শরীরেও তাঁর চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু ছিল ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের মানুষ। তিনি তাঁর হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছেন, মানুষ তখনই সুখী যখন সে একা থাকে। জগতে সকলের কল্যাণ কামনা করা যেতে পারে, সকলকে ভালো লাগতে পারে কিন্তু ভালোবাসতে গেলেই নিজেকে বন্ধনের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে হয়। আর ভালবাসার বন্ধনই যত দুঃখ অনন্তকাল ধরে সৃষ্টি করে আসছে।

অন্যদিকে গ্রন্থের পরবর্তী গল্প হল 'এদেশে আমি কি করতে চাই'। কাহিনিতে উঠে এসেছে, স্বামীজিকে পাশ্চাত্যের মানুষ প্রবল ভালোবাসায় আপন করে নিয়েছিল। তাই দেশের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞ। কিন্তু স্বদেশের প্রতি তাঁর সারা জীবনের আনুগত্য। স্বদেশের মঙ্গলের জন্য যদি তাঁকে বারেবারে জন্মগ্রহণ করতে হয়, তবে প্রতিটি জীবনে তিনি তাঁর স্বদেশবাসীর সেবায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করবেন। এই গল্পেই স্বামীজি ভারতের মানুষের প্রতি যে কথা বলেছেন, তা শুধু তাঁর কালেই নয়, সমগ্র দেশ–কালে সমানভাবে প্রযোজ্য। তিনি চাইতেন দেশের প্রতিটি মানুষ যেন হৃদয়বান হয়। কারণ হৃদয়ের দ্বারাই মহাশক্তির জাগ্রত হয়। তিনি একই সঙ্গে প্রেমিক হতেও বলেছেন। কেননা, প্রেম সমস্ত অসম্ভবকে সম্ভব করে। হৃদয়বান ও প্রেমিক মানুষদের মধ্যেই লুকিয়ে অনন্ত শক্তি, সেই শক্তিতেই জগতের কল্যাণ হবে। তিনি মানুষকে কর্মের কথা বলতেন।

গ্রন্থের অপর গল্পটি হল 'পাশ্চাত্যে দ্বিতীয়বার'। কাহিনির মধ্যে স্বামীজির জীবনদর্শন প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, প্রেমের চেয়েও বড় আর একটা বিষয় হল মিলনসাধন। যে মিলনেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সমন্বয় গড়ে উঠবে। গ্রন্থের পরের গল্পের নাম হল 'আমি বিশ্বাস করি'। গল্পে স্বামীজি বলেছেন, যতখানি ঈশ্বরকে তিনি বিশ্বাস করেন, ঠিক ততখানি মানুষকেও তিনি বিশ্বাস করেন। সেই মানুষ যে ধর্ম সম্প্রদায়ের হোক না। তিনি বিশ্বাস করতেন, সকল ধর্মই সত্য। আবার মহাপুরুষদের প্রতিও তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে। যেমন, বুদ্ধদেবের প্রতি তাঁর ছিল শ্রদ্ধা, ভালবাসা ছিল অমলিন। যদিও তিনি বুদ্ধের সকল মতকে গ্রহণ করেননি, তবুও তাঁর কাছে তিনি ছিলেন ঈশ্বরসম। গ্রন্থটির শেষ গল্পটি হল 'বিদায়ের বাণী'। এই গল্পে স্বামীজি বলেছেন, তিনি তাঁর জীবনে যে কাজের প্রতি দায়বদ্ধ ছিলেন তা করতে পেরেছেন। তিনি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছন, সমগ্রজীবনে একমাত্র শাশ্বতসত্য জীবন দুঃখময়। কিন্তু মানুষের জন্য সেই দুঃখকে জয় করতে হবে। গল্পের শেষে তাঁর চিরন্তন উপলব্ধি প্রকাশিত হয়েছে, তাঁকে বোঝার জন্য আর একজন বিবেকানন্দের প্রয়োজন, তবেই বোঝা যাবে তিনি কি করে গেলেন।

ঙ. মহামানব স্বামী বিবেকানন্দ :

মহামানব স্বামী বিবেকানন্দের পরিচয় অতি নিবিড়তা লাভ করেছে বাংলা কথাসাহিত্যে বিস্তৃত পরিসরে। ঔপ্যনাসিক প্রদ্যোৎ গুপ্তের 'স্বামী বিবেকানন্দ' (১৯৫৯) উপন্যাসের মধ্যে তার সার্থক প্রকাশ লক্ষ করা যায়। গ্রন্থের মধ্যে মহামানব স্বামীজির পরিচয়কেই তুলে ধরাই ছিল লেখকের অন্যতম উদ্দেশ্য। স্বল্পয়াতন গ্রন্থটিতে সেই উদ্দেশ্যকে সফল করেছে। প্রথমেই বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় কাহিনী শুরু হয়েছে নাটকীয়ভাবে; বিশ্বনাথ দত্ত বিলেকে হুঁকোতে টান দিতে দেখে জানতে

চান সে কি করছে। উত্তরে সে জানায়, হুঁকো টানলে তাঁর জাত যায় কি না সেটাই সে দেখছে। সুনিপুনভাবে লেখক জানিয়ে দিলেন, বাল্যকাল থেকেই স্বামীজির মধ্যে মানবমহিমার জাগরণ ঘটেছিল।

স্বল্প পরিসরে কাহিনির মধ্যে মহামানব স্বামীজির পরিচয় বারেবারে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন, বেলুড় মঠে একদিন এক মাতাল নেচে গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করে দেয়। মঠের সন্ন্যাসীরা তাকে অল্প প্রসাদও খেতে দেয়। স্বামীজি এই ঘটনাটি লক্ষ করেন। মাতাল ব্যক্তিটি চলে গেলে তিনি জানতে চান তাকে কি খেতে দেওয়া হয়েছিল? শুধু প্রসাদ দেওয়া হয়েছিল শুনেই তিনি রেগে গিয়ে বলেছিলেন, যে লাখ টাকার আনন্দ দিয়ে গেল তাকে শুধু বাতাসা খেতে দিলে হয়। পরক্ষণেই তিনি এদেশ দেন তাকে দুটো টাকা দেওয়ার জন্য। জীবনটা কত কষ্টের তা তিনি কৈশোরেই উপলব্ধি করেছিলেন।

মণি বাগচীর 'সেই বিশ্ববরেণ্য সন্ন্যাসী' (প্রকাশসাল পাওয়া যায়নি) গ্রন্থে স্বামী বিবেকানন্দকে বহুভাবে ও বহুরূপে প্রকাশিত করেছেন। স্বামীজির মানবমহিমাকে যেমন লেখক তুলে ধরেছেন, ঠিক তেমনি স্বামীজির মহামানব রূপটিকেই তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। এক জীবনের আধারে তাঁর ভাবপ্রকাশ যে বহু বিচিত্র, বহু ভাবে ব্যঞ্জনাময় তারই পরিচয় পাওয়া যায় এই গ্রন্থের মধ্যে। তাঁর স্বল্পায়ু জীবনের আবেদন মানুষের কাছে কত গভীর, কত কৌতূহলের তা লেখক দেখিয়েছেন। তাঁর জ্ঞানের ও কর্মের যে আলো তা ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র ভারতবর্ষে, সমগ্র পৃথিবীতে। তিনি দেশ ও জাতির জীবনে ঘটিয়েছিলেন নব সূর্যোদয়। এরপরের কাহিনিতে দেখা যায়, শিকাগো ধর্মমহাসভায় সমস্ত সভ্যজগত শুনল স্বামীজির বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে শাশ্বত ভারতের কথা। লক্ষ্যণীয় ভাষার প্রাচুর্যে, আবেগের প্লাবনে লেখক তাঁর বক্তৃতা সম্পর্কে লিখলেন, 'চকিতে তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো– 'হে আমার আমেরিকাবাসী ভাই-বোনেরা'।[৭] কিন্তু স্বামীজি বলেছিলেন, 'My Brothers and Sisters of America'। সমগ্র আমেরিকা উপলব্ধি করল, ধর্মমহাসভায় একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন সকল মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর আছেন।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'ভক্ত বিবেকানন্দ' (১৯৬২) গল্পগ্রন্থে স্বামীজি স্বমহিমায় উপস্থিত হয়েছেন। তাঁকে নিয়ে লেখক গল্পের ছলে কাহিনী সাজিয়েছেন। বেশীর ভাগ গল্পে তিনি গল্পের কথক। ফলে কাহিনীতে যুক্ত হয়েছে ভিন্নমাত্রা। গ্রন্থের প্রথমেই গল্পের নাম 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রনাথ'। ঠাকুরের আধ্যাত্মিক ও বেদান্ত দর্শনে নরেন্দ্রনাথ নিজেকে প্রতিমুহূর্তে আবিষ্কার করেছে, জেনেছে ঈশ্বরের স্বরূপ। এই কাহিনীর মধ্যে দেখা যায় স্বামীজি নিজেকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে সঁপে দিয়েছেন। তিনি ঠাকুরের সান্নিধ্য পেয়ে এক চরমতম সত্যকে উপলব্ধি করলেন, ঈশ্বর নামক সত্তাকে ভক্তি করা নয়, তাঁর পায়ে মাথা ছোঁয়ানো নয়, ঈশ্বর নামক সত্তাকে ভালোবাসতে হবে। সমস্ত যুক্তির সার কথা হল ঈশ্বরকে ভালোবাসা। এই ভালোবাসাই একদিন মানুষকে ভালোবাসতে শেখাবে। মানুষের মধ্যেই লুকিয়ে আছেন নারায়ণ। তিনি পরবর্তী সময়ে বলেছিলেন, মানুষ তখনই ভালোবাসতে পারে, যখন সে সকলের মধ্যে ঈশ্বরকে খুঁজে পাবে স্বামীজির জীবন যে জ্ঞান ও কর্মের স্বারা চালিত তা বারেবারে উপলব্ধি করা যায়। আবার একই সঙ্গে তিনি যে প্রেমের মূর্ত বিগ্রহ সে কথাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি জানতেন প্রেমের দ্বারাই মানুষকে ঈশ্বরের সমতুল্য করা যেতে পারে। এই গল্পে লেখক বলেছেন, ঠাকুর আর বিবেকানন্দ এক ও অভিন্ন। তাঁরা একে অপরের পরিপূরক। ঠাকুর জ্ঞান, কর্মের আবার ভক্তির, আর স্বামীজিও সেই জ্ঞান, কর্মের ও ভক্তির। ঠাকুর ও তিনি সেই প্রেমের ঘনীভূত বিগ্রহ। দ্বিতীয় গল্পের নাম 'কর্মযোগী বিবেকানন্দ'। এই কাহিনীর মধ্যে তাঁর কর্মের কথা ব্যক্ত হয়েছে। তিনি প্রচার করেছিলেন কর্মই জীবনের একমাত্র মন্ত্র। কর্মের মধ্যেই লুকিয়ে আছে জীবনের প্রাণ স্পন্দন। শিষ্য আলাসিঙ্গাকে তিনি বলেছিলেন, ভগবান তাঁকেই সাহায্য করেন, যিনি কর্মের মধ্যে নিজেকে মেলে ধরেছেন। তিনি সেই কর্মের কথা বলেছেন যা কোন ফলের আশা করে না, যে কর্ম জীবনকে বিস্তার করবে, যে কর্ম শুধু বিনিময়ে শুধু ভালোবাসা কামনা করে, যে ভালোবাসা স্বার্থশূন্য। তবে সেই কর্ম ক্রীতদাসের মতো নয়, তা হবে প্রভুর মতো।

গ্রন্থের পরবর্তী গল্পের নাম 'বিবেকানন্দ ও সাম্যবাদ'। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আদর্শ অনন্ত পথের মধ্যেই সেই এক গন্তব্যে যাওয়া, তা স্বামীজির কাছে পরম গ্রহণীয় হয়ে উঠেছে। ভিন্নতার মধ্যেই থাকবে বিচিত্রতা, আর সেখানেই থাকবে ঐক্য। তিনি মনে করতেন ঐক্য বা সাম্য সকল সময়ই শিবসাম্য। লেখক বলেছেন, নরেনের স্বরূপ সম্পর্কে ঠাকুর সবসময়ই মনে করতেন, নরেন শক্তির রূপ, সে সকলের থেকে আলাদা। স্বামীজি পাশ্চাত্যদেশে গিয়ে এই তত্ব প্রচার

করেছিলেন সমস্ত প্রাণীর মধ্যেই ব্রহ্ম অবস্থান করছে। তাই তিনি বলেছিলেন মানুষের মধ্যে যে অবস্থার পার্থক্য তা অতি সাধারণ ঘটনা। কিন্তু মানবিক গুণে সকল মানুষেই যে সমান তা চিরন্তন। স্বামীজি দেবতার নব রূপায়ন ঘটিয়েছিলেন। মানুষের মধ্যেই তিনি খুঁজেছিলেন দেবতাকে। সে দেবতা মাটির পৃথিবীতে আছে। সে দেবতা মানবিক গুণে মহান হয়ে আছে। তিনি হয়তো প্রথম সুদূর পাশ্চাত্য দেশে গিয়ে মানবিক ভাবনাকে জাগিয়ে তুললেন। মানবধর্ম সম্পর্কে স্বামীজি কি শিখিয়েছেন ডক্টর গ্রসম্যান তা বলেছেন,

> "শিখিয়েছেন ধর্ম শুধু চিন্তা নয়, ধর্ম কর্ম, জীবন্ত কর্ম। আমাদের ভাব আছে কিন্তু ভাবের রক্তমাংস যে কর্ম সেই কর্ম নেই। ...আমাদের ঈশ্বর আকাশে কিন্তু বিবেকানন্দের ঈশ্বর মাটিতে। আমাদের ঈশ্বর সিংহাসনে বসে আছেন, কিন্তু বিবেকানন্দের ঈশ্বর চাষ করছেন, মাটি কাটছেন, পাথর ভাঙছেন, ধুলো পায়ে হাঁটছেন মেঠো পথ ধরে।"[৮]

স্বামীজি মানবিক ভাবনার জগতে বিরাট এক পরিবর্তন এনেছিলেন। তিনি তথাকথিত সন্ন্যাসীর সংজ্ঞাকেই বদলে দিয়েছিলেন। তাঁর মতে সন্ন্যাসীর প্রকৃত কর্তব্য নিজের মুক্তি নয়, পরের জন্য মুক্তি, সেবা ও জীবন উৎসর্গ করা সন্ন্যাসের প্রকৃত ধর্ম। এই গল্পে লেখক তুলে ধরেছেন মানুষের মধ্যে মানবীয় গুণের উন্মোচন করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। মানবিক অনুভূতির যদি সৃষ্টি হয় তবেই আমাদের সমাজে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা হবে।

অন্যদিকে চতুর্থ গল্পের নাম হল 'ভারতসাধক বিবেকানন্দ'। এই কাহিনীর মুল কথা হল এক অখণ্ড ব্রহ্মস্বরূপ সকলের মধ্যে আছে। এই অখণ্ডতা ভারতবর্ষের অন্তরের সামগ্রী। স্বামীজি শোনালেন স্বদেশকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসার কথা, দেশের মানুষকে ভালোবাসার কথা। তিনি বলছিলেন, পরোপকারের কথা, এও জানিয়েছিলেন গেরুয়া বসন কর্মের প্রতীক। সাধারণ-দরিদ্র মানুষেরাই আমাদের দেবতা, তাঁদের সেবা করাই আমাদের ধর্ম। তিনি তাঁর শিষ্যদের এই কথা জানিয়েছেন ধর্মগ্রন্থের মধ্যে এক ধরনের সংকীর্ণতা আছে, কিন্তু মানুষের সেবা করার মধ্যে এক ধরণের মুক্তির আশ্বাস লুকিয়ে আছে। যে মুক্তির আলোয় স্বামীজি বলেছেন, তিনি ধর্মপ্রচারক নন, তিনি স্বদেশপ্রমিক। নিজের দেশ ও দেশের মানুষদের তিনি মন প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছেন। স্বামীজি জানতেন, তাঁর হয়তো সবচেয়ে বড় দোষ তাঁর সুগভীর দেশপ্রেম।

গ্রন্থের পঞ্চম গল্পের নাম হল 'ভক্ত বিবেকানন্দ'। এখানে ভাব, ভক্তি ও ভালোবাসায় ঠাকুর ও নরেন একাকার। পরমভাব নিয়ে ঠাকুর প্রকাশ করলেন ভক্তিতত্ব। আর স্বামীজি প্রকাশ করলেন আত্মবিশ্বাসের কথা। তিনি বলেছিলেন নাস্তিক হল যে নিজেকে বিশ্বাস করতে পারেনা। ভক্তির আবেগে পাশাপাশি প্রকাশিত হয়েছে নারী জাতির উপর স্বামীজির অপরিসীম শ্রদ্ধা। তিনি জানতেন ভারতবর্ষের যা কিছু গৌরব তার মূলে এই নারী সমাজ। তিনি তাঁর ভাষণ 'ভারতীয় নারীর আদর্শ– তে বলেছিলেন তাঁর জননীর কথা, কোথায় হিন্দু মেয়েদের চরিত্রের সৌন্দর্য ও মহত্ব লুকিয়ে আছে, তাদের তিতিক্ষা ও পবিত্রতা যা আজও চিরস্মরণীয়। নিজের মায়ের উপর স্বামীজির যেমন ছিল শ্রদ্ধ ও ভালোবাসা, ঠিক তেমনি গুরুপত্নী মা সারাদাদেবীর প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তি। সমগ্র জীবনে তাঁর চরণতলে তিনি নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের প্রতিও তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রকাশিত হয়েছে। মা কালীকে তিনি মনে করেছেন তিনিই আনন্দময়ী, তিনিই অভয়দায়ী। তাঁর মধ্যে মাতৃ শক্তির প্রকাশ ও কালী তত্ত্ব–ঈশ্বর তত্ব সকল কিছুই মাতৃ আরাধনায় মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে।

চ. মহাপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ :

মহামানবীয় চেতনায় স্বামী বিবেকানন্দের অস্তিত্ব স্বাভাবিক ভাবেই মহাপুরুষের পরিচয় লাভ করে। ধর্মীয় পরিসরে জনমানসের চেতনাজাগরণে তাঁর ত্রাতার ভূমিকা ক্রমশ মহাপুরুষের অবদান নানাভাবেই নিবিড় হয়ে ওঠে। বাংলা কথাসাহিত্যের পরিসরেও তার বিস্তৃতি লক্ষ করা যায়। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের অন্যতম উপন্যাস 'ভারতকন্যা নিবেদিতা'র (২০১৬) মধ্যে তা বিশেষভাবে উঠে এসেছে। উপন্যাসটির মধ্যে মহাপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের পরিচয় প্রাধান্য পেয়েছে। উপন্যাসের সময়কাল ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দ। কাহিনির কেন্দ্রবিন্দুতে আছেন ভগিনী নিবেদিতা থাকলেও তার ধারক ও বাহক স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁকে সামনে রেখেই লেখক নিবেদিতার জীবনের দিনলিপি নির্মাণ করেছেন। স্বামীজি লণ্ডনে এসেছেন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 63
Website: https://tirj.org.in, Page No. 530 - 545
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তাঁর সম্পর্কে মানুষের কৌতূহল অদম্য। স্বামীজিকে নিয়ে তাঁদের আলোচনার শেষ নেই। নিবেদিতার মানসনেত্রে তাঁকে প্রথম দেখার স্মৃতিটি সর্বসময়ের জন্যই উজ্জ্বল হয়ে আছে। তাঁকে দেখে নিবেদিতার মনে হয়েছে, তিনি যখন কথা বলেন তখন তাঁর মুখ বালকের মতো সারল্যে ভরে ওঠে। তাঁর সবচেয়ে বড় ব্যক্তিত্ব হল তিনি দুনিয়ার কাউকে পরোয়া করেন না। তাঁর স্বদেশ পরাধীন, সেই পরাধীন দেশের মানুষ হয়েও তিনি সর্ব অর্থেই স্বাধীন। সেই স্বাধীন চেতনার বিস্তার তিনি করবেন এই বিদেশিনীর মধ্যে। নিবেদিতাও সেই চেতনায় বিশ্বাসী। লেখক সুকৌশলে নিবেদিতার জীবনের ঘটনাকে সাজিয়েছেন। যে জীবনের মধ্যেই লুকিয়ে আছে সত্যকে পাওয়ার আকুলতা। যে আকুলতার কৌতূহল প্রশমিত হবে স্বামীজিকে দেখার পর। যদিও প্রথম যেদিন তিনি স্বামীজির কথা শোনেন, সেদিন সব কথাকে হৃদয়গম করতে পারেননি। ধীরে ধীরে তিনি উপলব্ধি করলেন এই মহাপুরুষকে। আন্তরিকভাবে গ্রহণ করলেন স্বামীজির বাণীকে। স্বামীজি 'শিক্ষা' সম্পর্কে চিরন্তন সত্যকে প্রকাশ করলেন।

অন্যদিকে ছোটগল্পের মধ্যেও মহাপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের পরিচয় নিবিড়তা লাভ করেছে। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'জগৎচন্দ্র হার' গ্রন্থের প্রথম গল্প 'জগৎচন্দ্র হার শ্রীরামকৃষ্ণ'। উক্ত গল্পে শ্রীরামকৃষ্ণ কালের কাণ্ডারি, আর বিবেকানন্দ তাঁর সেই প্রধান পার্ষদ। ঠাকুর মানবতার যে অগ্নি প্রজ্বলন করেছিলেন, সেই আগুনে শুদ্ধ হবেন নরেন্দ্রনাথ। ঠাকুর জানতেন তাঁর ভাবধারাকে পূর্ণ দেবে নরেন। নরেন হবে আগামী দিনের মানবাত্মা। যেমন অনেকের কাছেই ঠাকুর তাঁর মনের ভাবনা প্রকাশ করেছেন, কিন্তু অন্তরের চরমতম সত্যটি তিনি নরেন্দ্রনাথের কাছেই প্রকাশ করেছিলেন। ঠাকুর বলেছেন তাঁর স্বরূপ, তাঁর আত্মাকে সঠিক ভাবে চিনতে পেরেছে একমাত্র নরেন। এই গল্পেই স্বামীজি ঠাকুর সম্পর্কে লিখেছিলেন। ঠাকুর মানবসেবায়, মানবহিতের জন্য নিজের জীবন দান করে গেছেন। বিশ্রাম তাঁর জীবনে ছিল না। তাঁর কথা, তাঁর উপদেশ শোনার জন্য মানুষ দলে দলে আসত। এমনও হয়েছে সারাদিনে প্রায় কুড়ি-বাইশ ঘন্টা তাঁকে কথা বলতে হত। তাঁর কৃপা থেকে কেউই বঞ্চিত হয় নাই। মানবজাতির জন্য ছিল তাঁর সুগভীর প্রেম। ঠাকুর মা সারদাকে রেখে গিয়েছিলেন জগতের মা হওয়ার জন্য, আর নরেন্দ্রনাথকে তাঁর সকল কর্মভার দান করেছিলেন।

গল্পের পটভূমিকায় দেখা যায়, সেই সময়ে কলকাতা জুড়ে চলছে ব্রাহ্ম আন্দোলনের জোয়ার। এই অস্থির সময়ে নরেন তাঁর জীবন জিজ্ঞাসা দ্বারা মানবতার মন্ত্রে নিজেকে দীক্ষিত করেছিলেন। ঈশ্বরকে জানার ও দেখার কৌতূহলে থেকে তিনি গেলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে। তাঁর কাছেও পাওয়া গেল না সদুত্তর। সেই প্রশ্নের সদুত্তর তিনি পেলেন দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কাছে। ঠাকুরের কাছে শুধু ঈশ্বর দর্শনের কথা শুনলেন না, ঠাকুরের কাছে পেলেন জীবন সত্যের পরিচয়। ঠাকুর হয়ে উঠলেন তাঁর দুঃখসুখের কাণ্ডারি। স্নেহ, ভালোবাসায় ঠাকুর তাঁকে আপন করে নিয়েছিলেন। সংসারের অভাব অনটনে তিনি ছুটে গেছেন ঠাকুরের কাছে। ঠাকুরের কথায় তিনি গেলেন মা ভবতারিণীর মন্দিরে। মা কে দর্শন করে তিনি বলে উঠলেন, মা আমাকে বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও। মায়ের দর্শন সে যেন নিত্য লাভ করতে পারে সেই শক্তি যেন মা তাঁকে দেন। এরপর কাশীপুর উদ্যানবাটীতে ঠাকুর অসুস্থ অবস্থায় আছেন। তাঁর লীলাবসানের কয়েকদিন আগে স্বামীজি লাভ করলেন ঠাকুরের ঐশ্বরিক শক্তি। গুরুর দেহত্যাগের পরে সারা ভারত পরিভ্রমণ করে তিনি আমেরিকার বিশ্বধর্মমহসভায় নিজেকে ও মাতৃভূমি ভারতবর্ষকে স্থাপন করেছিলেন পাশ্চাত্যদেশে। আর স্বদেশবাসীদের জন্য রেখে গেলেন সেই চিরন্তন সত্যকে, যা সব দেশে সব কালে সমান গ্রহণযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, ধর্মকেই জীবনের অবলম্ববন করতে হবে, তা না হলে দেশের জীবনীশক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। স্বামী বিবেকানন্দ দেশ ও দশের কাছে রেখে গেলেন জীবনের সত্যকে, দান করে গেলেন মানবতাকে। প্রকাশ করলেন হৃদয়ের মধ্যেই লুকিয়ে আছে অনন্ত শক্তি। ভোগবাসনা, অশান্তি কখনই জাতির কাম্য নয়। ভালবাসা, শান্তি মানবের একমাত্র অবলম্বন হোক সকল মানুষের।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রীরামকৃষ্ণমেল' গ্রন্থের মধ্যে মহাপুরুষ স্বামীজির প্রসঙ্গ বারে বারে উঠে এসেছে। গ্রন্থের অন্যতম ছোটগল্প 'কে তুমি বিবেকানন্দ'। গল্পের শুরুতেই তিনি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ঠাকুরের উক্তিতে। ঠাকুর রতনকে বলেছেন, নরেনের মধ্যে কোন মেকিভাব নেই। অনেককেই তিনি দেখেন, কিন্তু তাঁর মতো আর একজনও দেখতে পেলেন না। সে জ্ঞানী, তাই ঠাকুর তাঁকে ভালোবাসেন। সেই নরেন্দ্রনাথ যেদিন প্রথম ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখলো, মনে মনে

ভাবলো একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির এক ব্যক্তি। উন্মাদের মতো ব্যবহার। আর প্রথম দর্শনেই ঠাকুর বুঝেছিলেন নরেনের স্বরূপ। সে যে নররূপী নারায়ণ।

কথাসাহিত্যে স্বামীজির বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় অতি নিবিড়ভাবে প্রকাশিত হলেও সেখানে ব্যক্তি স্বামীজির চেয়ে মহামানব স্বামীজির পরিচয় যেন বেশি নিবিড়তা লাভ করেছে। অনেক সাহিত্যিকই তাঁকে নিজের মত করে রূপদান করেছেন। বিশেষ করে স্বামীজির বহুধাবিস্তৃত ব্যক্তিত্বের অতুলনীয় প্রকাশ ও তাঁর মানবহিতৈষী কর্মতৎপরতার উজ্জীবনী প্রয়াস তাঁকে ক্রমশ অলৌকিক চেতনায় মহামানব থেকে মহাপুরুষীয় অবতার করে তোলা হয়েছে। বাংলা কথাসাহিত্যের পরতে পরতে তার পরিচয় সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সেখানে কথাসাহিত্যের বাস্তবতার ভুবনে অলৌকিক কল্পনার বিস্তার স্বাভাবিকতা লাভ করেছে। সময়ান্তরে স্বামীজির প্রভাব যে ক্রমশ প্রাসঙ্গিকতায় নিবিড়তা লাভ করে চলেছে, বাংলা কথাসাহিত্যে তাঁর বিস্তৃতিতেই তা প্রতীয়মান।

Reference:

১. চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব, স্বামী বিবেকানন্দ এক অনন্ত জীবনের জীবনী (পঞ্চম খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০২০, পৃ. ২৭৮
২. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, প্রথম আলো, আনন্দ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৬, প্রথম অখণ্ড সংস্করণ জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ২৫৪
৩. চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব, স্বামী বিবেকানন্দ এক অনন্ত জীবনের জীবনী (চতুর্থ খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১৫, পৃ. ১৭৩
৪. চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব, স্বামী বিবেকানন্দ এক অনন্ত জীবনের জীবনী (পঞ্চম খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০২০, পৃ. ২২৪
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, রঞ্জন, প্রাণসখা বিবেকানন্দ, পত্রভারতী, কলকাতা, প্রথম অখণ্ড সংস্করণ মে ২০১৯, পৃ. ৯
৬. শংকর, আমি বিবেকানন্দ বলছি, সাহিত্যম্‌, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ মার্চ ২০১০, পৃ. ১৬৭
৭. বাগচী, মণি, সেই বিশ্ববরেণ্য সন্ন্যাসী, সুতপা প্রকাশনী, কলিকাতা, প্রকাশসাল পাওয়া যায়নি, পৃ. ৪৭
৮. সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার, ভক্ত বিবেকানন্দ, (রচনাবলী সপ্তম খণ্ড), গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬২, পৃ. ৬১

Bibliography:

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' (প্রথম খণ্ড), এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ ১৩৬৫

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বীরেশ্বর বিবেকানন্দ (দ্বিতীয় খন্ড), এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, মাঘ ১৩৫৫

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বীরেশ্বর বিবেকানন্দ (তৃতীয় খণ্ড), এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, মাঘ ১৩৭৬

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, ভক্ত বিবেকানন্দ, (রচনাবলী সপ্তম খণ্ড), গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬২

অন্নপূর্ণা দেবী, স্বামী বিবেকানন্দ, নব গ্রন্থ কুঠির, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৩৩০

প্রদ্যোৎ গুপ্ত, 'স্বামী বিবেকানন্দ', চক্রবর্তী এন্ড কোম্পানী, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ১৯৫৯

মণি বাগচী, 'সেই বিশ্ববরেণ্য সন্ন্যাসী', সুতপা প্রকাশনী, কলিকাতা, (প্রকাশসাল পাওয়া যায়নি)

নিমাই ভট্টাচার্য, 'বিপ্লবী বিবেকানন্দ', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 63
Website: https://tirj.org.in, Page No. 530 - 545
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, 'বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ', দেব সাহিত্য কুঠীর প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১৯
রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়,' প্রাণসখা বিবেকানন্দ', পত্রভারতী, কলকাতা, প্রথম অখণ্ড সংস্করণ, মে ২০১৯
রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সরলা ও সন্ন্যাসী জীবনের ঝরাপাতা ও বিবেকানন্দ', দীপ প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, মে ২০১৮
গুরুপ্রসাদ মহান্তী, 'বিলে', সৌকর্ষ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১৪
শংকর মুখোপাধ্যায়'আমি বিবেকানন্দ বলছি', সাহিত্যম্, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০০৮, ষষ্ঠ সংস্করণ ২০১০
শ্রীমতী গুপ্ত, বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ, অনির্বাণ প্রকাশনী, কলিকাতা, প্রকাশ ১৯৫৭
সুজিত কুমার নাগ, 'বীর সাধক বিবেকানন্দ', আদিত্য প্রকাশালয়, কলিকাতা, (প্রকাশ সাল পাওয়া যায় নি)
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, 'স্বামী বিবেকানন্দ এক অনন্ত জীবনের জীবনী' (প্রথম খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১২
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, 'স্বামী বিবেকানন্দ এক অনন্ত জীবনের জীবনী' (দ্বিতীয় খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১৩
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, 'স্বামী বিবেকানন্দ এক অনন্ত জীবনের জীবনী' (তৃতীয় খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং,কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৪
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, 'স্বামী বিবেকানন্দ এক অনন্ত জীবনের জীবনী' (চতুর্থ খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১৫
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, 'স্বামী বিবেকানন্দ এক অনন্ত জীবনের জীবনী' (পঞ্চম খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০২০
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, 'শ্রীরামকৃষ্ণ মেল', শৈব্যা পুস্তাকালয়, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৩
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, 'জগৎচন্দ্র হার', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃলিঃ, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৩৭০
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, রসেবশে প্রথম পর্ব, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রকাশসাল, ২০১৫
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, রসেবশে প্রথম পর্ব, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রকাশসাল ২০১৫
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, মাপা হাসি চাপা কান্না অখণ্ড, পত্রভারতী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১০, অষ্টম মুদ্রণ ২০১৮
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, 'প্রথম আলো', আনন্দ, কলকাতা, প্রথম অখণ্ড সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১০
লেখকের নাম অজ্ঞাত, 'বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ', শ্রীশরণাপুরী, প্রথম সংস্করণ, মাঘ ১৩৬৯